নারী ও মজুরি

উম্মে মুসলিমা

একটা চমৎকার বিজ্ঞাপনের কথা নিশ্চয় মনে আছে অনেকের। দিন শেষে মাটিটানা শ্রমিকদের মজুরি মিটিয়ে দিচ্ছেন মালিক। পুরুষদের যে মজুরি দিচ্ছেন নারীদের দিচ্ছেন তার অর্ধেক। তা দেখে নারী শ্রমিকরূপী কাঙালিনি সুফিয়া বলে উঠলেন, 'এ আবার কোন দেশি বিচার?' মালিক বললেন, 'মেয়েমানুষদের মজুরি এরকমই'।

অনেকদিন থেকেই পরিকল্পনা করছিলাম নারীর মজুরি নিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখার। নারীর মজুরি পুরুষের সমান নয় বরং দ্বিগুণ হওয়া উচিত। যেখানে সমপরিমাণ মজুরি পাওয়াই দুষ্কর, সেখানে দ্বিগুণ দাবি হাস্যকর ঠেকবে বলে লেখা হয়ে ওঠে নি। কিছুদিন আগে একটি দৈনিকে ফরিদা আখতারের একটা লেখার এক জায়গায় 'নারীর মজুরি পুরুষের দ্বিগুণ হওয়া উচিত'-এর উল্লেখ দেখে আজকের এ রচনা লিখতে সাহস পেলাম।

বিধাতাকে পুরুষ কল্পনা করে বলা হয় 'বিধাতাপুরুষ'। মাঝে মাঝে মনে হয়, কথাটা বোধহয় মিথ্যে নয়। বিধাতাই যদি নারী-পুরুষ সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে সেখানে বৈষম্য প্রকট। পুরুষদের জীবদ্দশার অধিকাংশ সময়জুড়ে রজঃকাল নেই, সন্তানধারণ নেই, জন্মদান নেই, স্তনদান নেই, জরায়ুর রোগ নেই, স্তনক্যানসার নেই, রজঃমুক্তি নেই, যৌনাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নেই। আছে মুসলমান পুরুষদের খৎনা বা মুসলমানির দিনকয়েকের কষ্ট। তারপরেও এক ছ'বছরের ছেলেশিশু তাকে মুসলমানি দেয়ার সময় দুঃখ করে বলছিল, 'মেয়ে হওয়াই ভালো ছিল, মেয়েদের তো আর মুসলমান হওয়া লাগে না'। থাকার মধ্যে বেশির ভাগ পুরুষের যা আছে সেটা হচ্ছে ইন্দ্রলুপ্ততা। মানে টাক পড়া। যা নারীদের মধ্যে বিরল। সেটা অবশ্য জীবনচলার ক্ষেত্রে তেমন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। কেবল বিয়ের পাত্র হিসেবে কিঞ্চিত দাম কমায়। আধুনিক প্রযুক্তি সে আশঙ্কাকেও উড়িয়ে দিচ্ছে। চুল প্রতিস্থাপনের ব্যয়বহুল সৌন্দর্য পুনরুদ্ধারে ধনী পুরুষরা এটুকু খামতিও পুষিয়ে নিচ্ছেন। পুরুষ কাজেই মুক্ত বিহঙ্গ। আর নারী?

আদিযুগে যখন ছিল না কোনো সম্পত্তির ধারণা, ছিল না উত্তরাধিকার, ছিল না আইন, ছিল না সংস্থা, উপাসনা করা হতো অলিঙ্গ টোটেমের, তখন নারীর মর্যাদা ছিল। প্রকৃতিকে মনে করা হতো মায়ের মতো। নারী জন্ম দেয় সন্তান, প্রকৃতি ফসল। এ কারণেই কৃষিকাজের ভার অনেকটাই দেয়া হতো নারীর ওপর। সন্তান ও শস্যকে দেবতাদের দান বলে গণ্য করা হতো বলেই উর্বরতার শক্তি হিসেবে নারী ছিল পূজনীয়। অতঃপর শতাব্দীপরম্পরায় নারীর ভাগ্য জড়িয়ে যায় সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার সাথে। পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার কালে পুরুষ নারীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় সম্পত্তির মালিকানা ও দানের সকল অধিকার। কিন্তু একথাও তো সত্যি যে, নারীর শরীর এবং শারীরিক প্রক্রিয়াগত কারণেই তাকে পুরুষদের সমযোগ্যতার কাজ থেকে বাধ্য হয়ে বিরত থাকতে হয়েছে। অদ্যাবধি নারীজাতি সেই বঞ্চনার ঘূর্ণাবর্তে পাক খেলেও নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই আজ ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন। কিন্তু পদে পদে বাধা ঠেলতে গিয়ে রক্তাক্ত হতে হচ্ছে তাদের, প্রতিক্ষেত্রে।

যৌবন হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে কর্মক্ষম সময়। একেক দেশে যৌবনের সময় একেকরকম ধরা হলেও মোটাদাগে ১৮ বছর থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত সময়কে যৌবন বলা চলে। এদেশে গ্রামাঞ্চলে এখনো

নারীকে 'কুড়িতেই বুড়ি' বলে অভিহিত করা হয়। তার মানে ওখানে নারীর যৌবন ধরা হয় ১৩ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। এমনকি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাসের নায়িকাকে বলতে শুনি, 'জীবনের ছাব্বিশটা বছর পার করে দিয়ে আজ আর যৌবনের দাবি করিনে'।

হয়ত অনেকে বলবেন, নারী শ্রমজীবীরা আর কত দাবি করবে? মাতৃত্বকালীন ছুটি বাড়িয়ে ছ'মাস করা হয়েছে। তারা সমান অধিকার দাবি করে, আবার সংরক্ষণও চায়। মেয়েমানুষ বলে হরতালে কর্মক্ষেত্রে না-আসার মিনতি করে। বেতন তো পুরুষের চেয়ে কম নেয় না। জেন্ডার সমতা নিয়ে জাতিসংঘের সনদ দেখায়। এখনো অনেক শিক্ষিত পুরুষ মনে করেন, আসলে নারীর কর্মক্ষেত্র হওয়া উচিত ঘর-সংসার, সন্তান লালনপালন, রান্নাবান্না, সেবাযত্নকে ঘিরে। বাইরের কাজ পুরুষের। ঘরে থাকতে কে না চায়? আমরা সবাই তো ছুটির জন্যে মুখিয়ে থাকি। ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১১৩ দিন সরকারি ছুটি, ২০ দিন নৈমিত্তিক, তার ওপর ঐচ্ছিক না-দিলে মুখ গোমড়া করি। তবে কি শুধু জীবনজীবিকার জন্যই আমরা ঘরের বাইরের কাজ করি? আত্মোন্নয়ন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সমাজের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাষ্ট্রের উন্নয়ন, দেশের উন্নয়নের কথা কি ভাবি না? যদি ভাবিই, তাহলে এ গুরুদায়িত্ব কি কেবল পুরুষের? তাহলে অনেক পুরুষকে এমন কেন বলতে শুনি যে, 'মেয়েরা তো চাকরি করেন শুধু নিজের শাড়ি গয়নার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য'। এক হিসেবে বেঁচে থাকার তাগিদেই সবাই কাজ করে থাকে, কিন্তু কাজটা মূলত চলে যায় দেশ ও দশের উন্নয়নে। সন্তানধারণ ও লালনপালন করা অফিস আদালত বা অন্য কোনো শ্রমসাধ্য কাজের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। কিন্তু তারপরেও নারী কেন বাইরের কাজ করতে চায়? কারণ তারাও চায় নিজস্ব পরিচয়। অমুকের মেয়ে, অমুকের স্ত্রী, অমুকের বোন বা মা পরিচয়ে সমৃদ্ধ হবার জন্য নারী উচ্চশিক্ষায় খামোখা কাঠখড় পোড়াচ্ছে না। পুরুষসমাজ চাচ্ছে বলেই নারী কাজে নামছে না। মানুষ হিসেবে তার দায় তারা অস্বীকার করতে পারে না বলেই শত প্রতিবন্ধকতাকে ঠেলে কাজে নামছে।

কিন্তু নারীর মজুরি দ্বিগুণ করার পেছনে যৌক্তিকতা কী?

নারীকে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতা টপকাতে হয়। কী শরীরে, কী সংসারে। আট-ন' বছর বয়স থেকে নারীর শারীরিক কাঠামোয় পরিবর্তন আসে। ছেলেরা উন্মুক্ত শরীরে যেখানে সারাজীবন মুক্তানন্দে কাটিয়ে দিতে পারে, সেখানে শৈশব থেকেই মেয়েদের ওপর পোশাকের বোঝা চাপাতে হয়। শুরু হয় তার চলার পথের প্রথম প্রতিবন্ধকতা। এরপর নয়-দশ বছরে শুরু হওয়া মাসিক রজঃকাল পঞ্চাশ-পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রতিমাসে পাঁচ-সাত দিন মেয়েদের কী পরিমাণ যন্ত্রণা, অসুবিধা ও সতর্কতার মধ্যে কাটাতে হয় তা পুরুষরা বুঝবেন না। এই কিছুদিন আগেও সচিবালয়ের একজন নারী সিনিয়র সহকারী সচিবকে কমন টয়লেট ব্যবহার করার জন্য রাগে-দুঃখে গজগজ করতে শোনা গেল। সে টয়লেটে নেই কোনো টিস্যু পেপার, নেই কোনো ঢাকনাঅলা ঝুড়ি, নেই সাবান। ঋতুকালে তিনি যতবার টয়লেটে যাচ্ছিলেন, ততবারই নিজের ব্যাগ খুলে লিকুইড সাবান, টিস্যু, প্যাড এসব সতর্কভাবে নিয়ে বাথরুমে ঢুকছিলেন। ঋতুর বিষয়টি একেক নারীর ক্ষেত্রে একেকরকম। সবারই নিয়মিত ঋতু হয় তা নয়। অনিয়মিত পিরিয়ড নিয়ে কর্মজীবী নারীরা অনেকেই ঝামেলায় পড়েন। প্রস্তুতি নেই, হুট করে হয়ে গেল। তখন না-থাকে ধারে-কাছে টয়লেট, না প্যাড, না সাহায্যকারী। কারো রক্তের ধারা কম, কারো প্রবল। কোনো মিটিংয়ে একটানা দু'-এক ঘণ্টা বসে থাকার পর উঠে দাঁড়ালেই প্যাড উপচিয়ে কাপড়-চোপড় শরীর ভেসে যায়। কারো কারো পাঁচ-সাত দিনের বেশিও পিরিয়ড প্রলম্বিত হয়। বড়ো বড়ো অফিস আদালতেই নারীর জন্য টয়লেটের এ হাল, ভেবে দেখুন পোশাকশিল্পে নিয়োজিত ত্রিশ-চল্লিশ লাখ

নারী কী অমানুষিক দুর্ভোগের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে দিন কাটায়। এসব নিয়েও নারীকে সমানভাবে কাজে নামতে হয়।

নারীকে শরীর ও সন্তান সামলিয়ে বাইরে কাজ করতে হয়। সন্তানসম্ভবা নারীমাত্রই জানেন, দীর্ঘ সাড়ে ন'মাস কর্মক্ষেত্রে তার কত অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়। এ সময় যাঁরা আর্লি সিকনেস বা মর্নিং সিকনেসে ভোগেন, তাঁরা সকালে কাজের শুরুতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেটা সামলে নিতে নিতেই অর্ধেক বেলা গড়িয়ে যায়। অনেকের চিকিৎসক সাফ বলে দেন, প্রথম চার মাস টানা বেড রেস্টে থাকতে। কর্মক্ষেত্র এসব অজুহাত শুনতে নারাজ। স্থায়ী নয় যাঁদের চাকরি, তাঁরা সন্তানের আশায় চাকরি হারান। যাঁদের স্থায়ী, তাঁদের নানা কথা শুনতে হয়। এমনও দেখা যায়, ট্যুর বা অতিরিক্ত কাজের চাপে অনেক নারীর প্রথম সন্তানটি মিসক্যারেজ হয়ে যায় এবং পরবর্তী জীবনে আর সন্তানধারণ সম্ভব হয়ে ওঠে না। ওদিকে সন্তানহীনতার দায়ে নারীর শ্বশুর-শাশুড়িসহ স্বামী আরেকটি বিবাহের কথা ভাবেন। গর্ভকালীন অ্যাডভান্স স্টেজে এসে ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হয়। যে অফিসে নারীর জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা নেই, সেখানে গর্ভবতীর কী হাল হয় ভেবে দেখুন। টেবিলে বসে যাঁদের কাজ, তাঁদের টানা বসে থাকতে থাকতে পায়ে পানি আসে, কোমরে ব্যথা হয়, ঘাড়-পিঠ ধরে আসে। ইচ্ছে হয় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে। কিন্তু অফিসে সেসব ব্যবস্থা বা নিয়ম নেই। এর চেয়েও বেশি সমস্যা মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষ হবার পর যখন সন্তানকে বাড়ি রেখে এসে কাজে যোগদান করতে হয়। সে এক নিদারুণ বিড়ম্বনা। শিশুকে স্তন্যদান যখন নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন সকালে কাজে এসে এক ঘণ্টার মধ্যে স্তন দুধে ভারী হয়ে আসে। ফারহানা বলছিলেন তাঁর সন্তান জন্মের পর অফিসে যোগদান-পরবর্তী কষ্টকর অভিজ্ঞতার কথা—

> সকাল আটটায় বাবুকে দুধ খাইয়ে অফিসে এসে পৌঁছালাম ন'টায়। ততক্ষণে বুক ভারী হয়ে আসছিল। সাড়ে ন'টায় মিটিং। মিটিং-এ বসে দশটার দিকে বুক টনটন করতে লাগল। ব্যথায় হাত নাড়ানো যাচ্ছিল না। তার একটু পরেই দু'স্তন দিয়ে দুধের ধারা নামতে লাগল। ব্লাউজ ছাপিয়ে শাড়ি ভিজে যেতে লাগল। মিটিং যখন শেষ হলো তখন ভেজা শরীরে টয়লেটে গিয়ে ব্যথায় কঁকাতে শুরু করলাম। শক্ত পাথরের মতো স্তন টিপে টিপে দুধ ফেলে দিলাম। টয়লেটে কোনো বেসিন ছিল না। বাড়তি ব্লাউজ-ব্রা না-আনাতে ওই ভিজেগুলোই পরে থাকলাম। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কয়েক দফা ভারমুক্ত হয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন বাবুকে বুকে তুলে নিয়ে কেঁদেকেটে তবেই শান্তি। অনভ্যস্ততার জন্য সারাদিন বাবুকে কেউ ফিডার খাওয়াতে পারে নি। বাবু সারাদিন কেঁদেছে। ভিজে শরীরে থাকার কারণে রাতে গা কাঁপিয়ে জ্বর এল। পরের দিন থেকে সর্দি লেগে বাবুরও জ্বর।

নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে অনেক নারীকেও দেখা যায় ইট ভাঙতে, ইট-বালুর ঝুড়ি টানতে, মাটি কাটতে। তাদের শ্রমে যেসব রাস্তাঘাট, বিল্ডিং তৈরি হয়, তার আশেপাশে কোনো পায়খানা-প্রস্রাবখানা থাকে না। পুরুষরা যেকোনো জায়গায় তাদের বাহ্যক্রিয়াদি সম্পন্ন করতে পারে, কিন্তু নারীরা কোথায় যায়? এসব নারীর বেশির ভাগই যুবানারী, তারা রজঃকালীন সমস্যার সমাধান করে কীভাবে? অনেকে একটু বড়ো সন্তানের জিম্মায় কোলের সন্তানকে রেখে দেয়, শিশুকে স্তন্যদান করার অসুবিধা কি কেউ দেখে? আবার যাদের শিশুসন্তান আছে, তাদের কাজ পাওয়াও কঠিন। কারণ শিশুসন্তানের দেখাশোনার জন্য কাজের সময় ব্যাহত হয়। কিন্তু যে নারীটিকে তার স্বামী ছেড়ে গেছে সন্তানসহ, সে কাজ না-করে কোথায় দাঁড়াবে? ট্রাফিক জ্যামে থেমে থাকা দামি দামি গাড়ির বন্ধ

কাচের বাইরে? তারপরে আমরা যখন সামান্য কাচ নামিয়ে দুটো টাকা দেবার বদলে বলে দেই, 'সোমত্ত মেয়েমানুষ, কাজ করে খেতে পার না, ভাগো!' তখন?

ফেসবুকের চিফ অপারেটিং অফিসার শেরিল স্যান্ডবার্গ বলেন,

> যদি তুমি অনেক বড়ো কিছু স্বপ্ন দেখো, নিজের সফলতাকে নিজের মাঝে ধারণ করে নাও, যদি তুমি নেতৃত্ব দাও তাহলে বাইরে অনেক কিছুর মূল্য চুকিয়ে ব্যক্তিগত জীবনেও কিছুটা বিসর্জন দিতে হয়। পুরুষদের অবশ্য নারীদের চেয়ে অনেক কম ত্যাগ করতে হয় পেশাদার ও ব্যক্তিগত জীবনে সফল হওয়ার জন্য। পুরুষদের দিনের যতটকু সময় কাজ করতে হয়, নারীদের তার থেকে দ্বিগুণ কাজ করতে হয় এবং তাদের থেকে তিনগুণ বেশি পরিবারের খেয়াল রাখতে হয়। তাই নারীদের ক্ষেত্রে কর্মজীবনের একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়— তুমি কি জীবনসঙ্গী চাও না? চাইলে সে কে? যদি তুমি এমন কাউকে বেছে নাও যে তোমার ব্যক্তিগত জীবনের সব বোঝা এবং সুখ ভাগাভাগি করবে, তাহলে তুমি জীবনে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবে। পৃথিবীটা হয়ত তাহলে আরো অনেক সুন্দর হবে, যদি পুরুষেরা সংসারের অর্ধেক দায়িত্বের ভার নেয় আর নারীরা কর্মক্ষেত্রের অর্ধেক দায়িত্বের ভার নেয়। আমার ছয় বছরের ছেলে ও তিন বছরের একটি মেয়ে আছে। তাদের ঘিরে আমার স্বপ্নের শেষ নেই। আমি চাই আমার ছেলে ও মেয়ে উভয়ে তাদের পরিবার এবং বাইরে সমান দায়িত্ব পালন করবে।

তবে অনুন্নত-উন্নত সব দেশেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে নারীকে বাইরের কাজ সেরে এসে ঘরের কাজও করতে হয়। হয়ত স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বাইরে কাজ করেন, একসাথেই ফিরলেন ঘরে, কিন্তু স্বামী বসে গেলেন রিমোট হাতে টিভি দেখতে, আর স্ত্রীকে বাইরের কাপড় না-পালটিয়েই চা-নাশতার ব্যবস্থা করতে হলো। রাতে হয়ত একটা নিমন্ত্রণ আছে কোথাও। স্বামী বললেন, কই রেডি হয়ে নাও তাড়াতাড়ি। এদিকে বাচ্চাকে খাওয়ানো-পরানো, বয়স্কদের রান্নাবাড়া, টেবিলে খাবার দেয়া, তারপরে গরমে নেয়ে উঠে একটু গোসল সেরে ফিটফাট হতে সময় দিতে হবে না? না, স্বামীর আক্ষেপ, আমার বউটা একটুও স্মার্ট না। কোনো কাজই চটপট করতে পারে না।

আমার একটা ছড়ার নাম 'শ্রমিক নারীর দিনলিপি'—

(কাজে বেরুনোর আগে যখন
নারীর সাথে কথোপকথন)
স্বামী : শার্টের বোতাম লাগিয়ে ইস্ত্রি করেছ তবে?
– আর বলতে হবে?
গোসলের গরম পানি, টেবিলে খাবার?
– জুড়িয়ে কাবার
আঁচল ঘুরিয়ে নাও, ছুটি হলে ফিরো সাথে সাথে
– (ছুটি কি আমার হাতে?)

শাশুড়ি : ওষুধগুলো খাইয়ে গেলে না, অ বৌমা
– দিই মা।

হটব্যাগে পানি কেমন ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে
– আরো একটা ভরা আছে আগে
বাজারটা সেরে এসো খোকা ট্যুরে যাবে
– আচ্ছা সে হবে।

টুকুন : ইসকুলে লেট হোক সেটাই কি চাও?
– ব্যাগ ভারী, আমাকেই দাও
রান্নাঘরে একদম না, হোমওয়ার্কের সময়
– চলো সোনা যাই।

(কাজ থেকে ফিরে এসে ঘরে
নারী ফের মুখোমুখি ঝড়ে)
শাশুড়ি : কাপড়টা ছেড়ো পরে আগে বানাও চা
খোকার আবার চড়া খিদে সহ্য হবে না।
– (বাহ্ বাহ্ বাহ্)
স্বামী : মাইনেটা পুরোটাই রেখে যাও ধরে
হাতখরচের টাকা আমি দেবো পরে
– (ওরে আমার কে রে)

(মুখে বলে 'সব সই' ক্ষোভগুলো উহ্য।
এহ বাহ্য!)

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী নারী দিবসের এক আলোচনায় বলছিলেন, চাষাবাদ, ফসল ফলানো, মাড়াই ইত্যাদি এদেশীয় প্রেক্ষাপটে পুরুষের কাজ হিসেবে বিবেচিত হলেও গ্রামের নারীরা এ সকল কাজের সাথেও জড়িত। গ্রামের পুরুষরা বড়ো বড়ো শহরে চলে আসছেন রিকশা/অটো চালাতে বা অন্যান্য নগদ পয়সার শ্রমে নিয়োজিত হতে। এখন নারীদেরই চাষাবাদ সামলাতে হচ্ছে। একজন পুরুষ কৃষক মাঠ থেকে তেতেপুড়ে ফিরলে নারী পাখা হাতে এগিয়ে আসে বাতাস করতে। কিন্তু নারী ফিরলে কোনো পুরুষ তাকে বাতাস করে না। উপরন্তু, ঘরে ফিরেই তাকে সংসার-সন্তান সামলাতে হয়। এখানে নারীর পরিশ্রম দ্বিগুণ না-হয়ে তিনগুণ হয়ে পড়ে।

যেসব নারী সংসার সামলিয়ে বাইরে কাজ করতে পারে না বা যোগ্যতা থাকলেও করতে দেয়া হয় না, সরকারের উচিত তাদের ভাতা প্রদান করা। কারণ এক. তারা ভবিষ্যতের সুনাগরিক তৈরি করছে, দুই. স্বামী বা অন্যান্য উপার্জনক্ষম পুরুষের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাসহ সময়মতো প্রয়োজনীয় সকল কাজ সেরে রাখছে, তিন. বয়স্কদের সেবা করছে, চার. পরিবারপ্রথাকে টিকিয়ে রাখতে নিজের সুখ বিসর্জন দিচ্ছে। এর সবগুলোই পরোক্ষভাবে দেশের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ। নারী দশভূজা হয়ে কাজ করলেও স্বামীরা বলেন, 'আমার বউ কোনো কাজ করে না'। অনেকে বলবেন, নারী কি টাকা-পয়সার মোহে সংসার করে? স্বামী-সন্তান-সুখী গৃহকোণ নারীর আজন্মলালিত স্বপ্ন। নারী প্রাণের টানে সন্তান মানুষ করে, প্রেমে-ভালোবাসায় সারাজীবন স্বামীসোহাগিনি হয়ে থাকতে চায়। হৃদয়ের আবেদন কি টাকা-পয়সায় মাপযোগ্য? কিন্তু একজন উপার্জনহীন নারীর কি নিজের মনের মতো কোনোকিছু কেনার বা খরচের শখ হতে পারে না? বাহ্, স্বামীদের কাছে চাইলেই তো সব পাওয়া যায়। স্বামীরা তো স্ত্রী-সন্তান-সংসার চালানোর জন্যই হাড়মা'স কালি করে বাইরে কাজ

করছে। বুকে হাত দিয়ে বলুন তো নারী, আপনারা স্বামীদের কাছে যা চান তা-ই পান, অথবা অনেকেই স্বামীদের কাছে এটা-ওটা চেয়ে ঘ্যানঘ্যান করা পছন্দ করেন? বেশ বুঝলাম, নারী নাড়ির টানে সন্তান মানুষ করে, এখানে কোনো স্বার্থ নেই। স্বামীকে ভালোবাসাও (যদিও রুমানা মঞ্জুরের স্বামীর মতো স্বামী এ সমাজে বিরল নয়) অপার্থিব। কিন্তু পান থেকে চুন খসলে আপনি রেহাই পান? কেন? আপনি হৃদয় উজাড় করে কোনোকিছুর বিনিময়ে নয়, কেবল প্রাণের তাগিদে সব করে যাবেন আর অন্যরা আপনাকে বিনেপয়সার ঝি মনে করবে— এটা মানতে ইচ্ছে করে? আপনার খুব বইপড়ার শখ, আপনার স্বামী বইকেনাকে ফালতু খরচ মনে করেন, কোথায় পাবেন নিজের শখ মেটানোর টাকা? জানি সরকারের কাছে এ দাবি হাস্যকর মনে হবে। বয়স্ক আর বিধবা ভাতা দিতে গিয়েই নাকি সরকারের রাজস্বে টান পড়ছে। পুরান পাগলে ভাত পায় না, নতুন পাগলে ধরে বায়না! পুরুষরা বলবেন, 'আরে বাবা কে বলছে তোমাদের বাইরে কাজ করতে? আমরা যা রোজগার করে এনে দেব তাতে চালাতে পারলে চালাও, না-হলে মুখে কুলুপ এঁটে থাকো। সন্তান-সন্ততি মানুষ করার দায়িত্ব তোমাদের, সেটাই ভালোমতো করো। বিয়ের দিন কনে সমর্পণের সময় তো বলেই দেয়া হয়, স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর।' কিন্তু বাবা-মার সহায়তা ছাড়া একার রোজগারে বিবাহিত জীবন শুরু করা গেলেও বেশিদিন টেনে নেয়া কঠিন। আবার যাদের পিতামাতা-ভাইবোনদের প্রতিপালন করতে হয়, তাদের জীবন দুর্বিষহ। আজ সারা বিশ্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে। পৃথিবীর অর্ধেক জনশক্তিকে কেবল শিক্ষিত জাতি গঠনের জন্য ঘরের মধ্যে পুরে রাখলে তার কতটুকু সম্ভব হবে তা বলাই বাহুল্য। মা-বাবা দুজনকেই অর্থ উপার্জনে ঘরের বাইরে সময় দিতে হলে সন্তান মানুষ করার দায়িত্বও দুজনের ওপরেই সমানভাবে এসে পড়ে। এর একটা উপকারি দিক হলো, এতে সন্তানরা ছোটবেলা থেকেই একটা বৈষম্যবর্জিত পরিবেশে মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগ পায় এবং নিজেদেরও সেভাবেই গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয়। তাছাড়া উন্নত জীবনযাপনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, সচ্ছল থাকার সহজাত বাসনা, আধুনিক জীবন উপভোগের অপরিহার্য অনুষঙ্গে নিজেকে শামিল করার জন্য সংসারে একজনের আয় আজ আর যথেষ্ট নয়। উপরন্তু, শিক্ষিত সন্তান জাতিকে উপহার দেয়ার জন্য প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষার বাজারে শিক্ষাদানের বিপুল ব্যয়ভার শিক্ষিত গৃহবধূ-মায়ের আর্থিক অংশগ্রহণ ব্যতীত একা পিতার পক্ষে বহন করা যে কেবল আকাশ-কুসুম পরিকল্পনা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া রোজগেরে নারী হীনম্মন্যতায় ভোগেন না, তাঁরা হন আত্মবিশ্বাসী। কর্তৃত্বপরায়ণ স্বামী কোনো অসতর্ক মুহূর্তে সন্তানসহ এক কাপড়ে বের করে দিলে তাকে অন্যের দারস্থও হতে হয় না। উপার্জনক্ষম মানুষ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করে আত্মপরিচয়ে বড়ো হওয়ার দীক্ষা পায়। কাজে লেগে থাকলে উচ্চশিক্ষা থেকে প্রাপ্ত বুদ্ধিমত্তার ধার অব্যবহারের দরুন দিনে দিনে ভোতা হয়ে পড়ে না, সর্বোপরি নিজের গণ্ডি ছোট হতে হতে বিন্দুতে পর্যবসিত হয় না বা অলস দুপুরে জানালায় দাঁড়িয়ে মনের বাতায়ন ঘেঁটে নিজের নামটি খুঁজে বের করতে গিয়ে দু'কূল প্লাবিত চোখের জলের সামনে রৌদ্রোজ্জ্বল দিন পরিণত হয় না ধূসর পাণ্ডুলিপিতে।

উচ্চশিক্ষিত নারীরা কেউ কেউ আজকাল ভাবছেনও যে, কী দরকার এত কষ্ট করার? তারচে' একটা কষ্টই সই। ঘরেই থাকি। ঘর-সংসার, বাচ্চা পালন করি। যাক চলে কোনোমতে জীবন। কিন্তু কদিন পরেই যখন দেখছেন যে, তিনি এক গণ্ডিবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন, তাঁর সিদ্ধান্ত বা মতামতকে কেউ তোয়াক্কাই করছে না, তখন ব্যক্তিত্বের সংকটে ভালো থাকা আর হয়ে ওঠে না। আবার কাজ খোঁজা, আবার দ্বিগুণ ব্যস্ততা।

অনেকে বলবেন, বেশ, চাকরিকালীন বিয়ে, সন্তান জন্মদান, স্তন্যদান, রজঃকাল, এসবের জন্যে নারীর অসুবিধার কথা ভেবে মজুরি দ্বিগুণ করা হলো। কিন্তু নারীর যখন একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর এসব অসুবিধা আর থাকে না, তখন কি মজুরি সমান হলে চলবে? না, তা-ও চলবে না। কারণ রজঃনিবৃত্তির আগে-পরে চল্লিশজনের একজন নারী জরায়ুর রোগে আক্রান্ত হন। দশজনের একজন স্তনক্যানসারে। এসবের কারণও ভবিষ্যতের নাগরিকদের জঠরে ধারণ ও লালনের মধ্যে নিহিত। এছাড়াও রজঃমুক্তির পর থেকে তাদের হাড়ক্ষয়জনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে হয়। অন্যদিকে পুরুষদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণে রাখলে ও নিয়মিত ব্যায়াম করলে কোনো রোগ সহজে কাছে ঘেষতে পারে না। বংশগতগুলো আলাদা ব্যাপার। কিন্তু নারীর রোগে নারীর কোনো হাত নেই। এ যেন অপ্রতিরোধ্য। এতসব প্রতিবন্ধকতা নিয়ে ঘরে-বাইরের কাজ করার মূল্য সাধারণের চাইতে বেশি হওয়াই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

সমাজ-সংসারে নতুন কিছু গ্রহণ করা সবকালে সবদেশেই অনেক ঝক্কির, অনেক সমালোচনার, অনেক প্রতিরোধের, কখনো কখনো জীবন সংশয়ের। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ, সতীদাহ বিলুপ্তি বা বিধবা বিয়ে একসময় অসম্ভব ছিল। নারীশিক্ষা বা নারীর চাকরিও ছিল সামাজিক রীতির বাইরে। কাজের মেয়াদ কমানো ও মজুরি বৃদ্ধির জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে বিপ্লবকারীদের। নারীর ভোটাধিকারের জন্য যুদ্ধ করতে হয়েছে। কোনো শুভই সহজে অর্জিত হয় নি। তবে একথাও সত্যি সমাজে বৈষম্যের বিরুদ্ধে যত বিপ্লব, যত পরিবর্তন, তার বেশির ভাগই নারীর উন্নয়নে। আর এ বিপ্লবকে বিজয়ে পরিণত করেছেন, নারীর সাথে নারীর প্রতি সহমর্মী মহান পুরুষরাই। এখনো আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক— এ কথা গায়ের জোরে অস্বীকার করা যাবে না। নারীকে যাঁরা বোঝেন, নারীর শ্রমকে যাঁরা সম্মান করেন, নারীর ক্ষমতাকে যাঁরা অনন্যসাধারণ ভাবেন, সেইসব পুরুষ সমাজে তাঁদের আসন আলো করে বসে আছেন। তাঁরা মানেন, নারীর যে অবদান তা টাকা দিয়ে পরিশোধের নয়, কিন্তু নারীর মজুরি পুরুষের দ্বিগুণ করা গেলে আবহমানকাল থেকে নারীর কাছে সমাজের যে ঋণ তা পরিশোধের কিঞ্চিৎ সুযোগ হয়ত পাওয়া যেত।

উম্মে মুসলিমা উন্নয়ন গবেষক। lima_umme@yahoo.com